মেঘেদের আত্মদর্শন

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

পাকুড়ের ডালটা পুকুরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। খসখসে গা। পাতাগুলো মিহিন সবুজ হয়ে আছে। একটি খয়েরি কেঁচো পাতা থেকে পাতায় হাঁটছে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে গন্ধ নিচ্ছে। বৃষ্টির গন্ধ, ভেজা মাটির গন্ধ! মেঘে অন্ধকার হয়ে আছে সমস্তটা। ভর দুপুর, অথচ মনে হচ্ছে বিকেল ফুরিয়েছে, এখুনি ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে আসবে। বৃষ্টি পড়ছে দু'এক ফোঁটা। পুকুরের জল কাঁপছে। ভাঁটু বসে বসে জলের ছটফটানি দেখছে। তার ভেতরে কী একটা যেন নড়াচড়া করছে। গলে গলে আসছে। গোবিন্দ এসে ভাঁটুর পেছনে বসল। বলল, মন খারাপ? এমন কইরা এহানে বইসা আছোস ক্যান?

ভাঁটু হাসে। বলে, মনে আর দোষ কী কও? সক্কাল সক্কাল যা হইল, হেডার পর মন ক চুপ কইরা থাকব?

গোবিন্দ ফিসফিস করে, মাইয়াটা অহনও বাগানে পইরা আছে। কী করা যায় কও দেহি! পাথর বাইন্দ্যা পুকুরে ফ্যালামু? হালার মাইয়া, সেও খতম, আমাগো ঝামেলাও খতম।

ভাঁটু ঘাড় নাড়ে।

বাড়িটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। ছাল-চামড়া খসে পড়েছে, আবছা। জানালাগুলোয় গরাদ নেই, দরজার কাঠ খুলে গেছে। ধার ঘেঁষে একফালি বাগান। বাগানে পড়ে আছে মেয়েটা। চোখ বোজা। বুক খুব দ্রুত ওঠানামা করছে, নীল শাড়ি এলোমেলো হয়ে আছে। ভেজা চুলগুলো মাটিতে অযত্নে এলিয়ে। কয়েক কুঁচি মুখের ওপরে। বৃষ্টি বাড়ল সামান্য। চোখের পাতায়, ঠোঁটে কয়েক কণা জল। মেয়েটা নড়ে উঠল, চোখ খুললল আলতো করে, ঠোঁট নড়ছে। কিছু বলছে!

গোবিন্দ ভাঁটুর দিকে চায়, মাইয়াটা কিছু কয় নাকি?

ভাঁটু পায়ে পায়ে মেয়েটার দিকে উঠে যায়। ঠোঁটের কাছে কান পাতে। ফিসফিস ফিসফিস। কী বলছে মেয়েটা? ভাঁটু ভালো করে শোনে, মেয়েটা বলছে, অবন অবন, কোথায় তুমি অবন?

গোবিন্দ ভাঁটুর কাঁধে হাত রাখে। কী কইতাছে মাইয়াটা?

– কয়, অবন অবন! হেই অবন কেডা?

– কে জানে? পেরেম-পিরিতের ব্যাপার আছে। চল আমরা কাইট্যা পড়ি। ভাঁচু নড়ে না। বলে, না, আমি যামু না। মজা দেখুম।

–আরে মজা দেখনের লাগে ঝামেলায় না পড়ি।

ভাঁটু হাসে, আরে ধুর, আমাগো আবার ঝামেলা!

মেয়েটা আস্তে আস্তে চোখ খোলে। সামনেটায় অন্ধকার। আকাশে মেঘ চুয়ে আছে। বৃষ্টি ভিজিয়ে দিয়েছে সমস্ত শরীর! মনে করার চেষ্টা করে কী হয়েছিল, ঠিক কী হয়েছিল? হাত দিয়ে মুখটা মোছে। আঁচল সামলায়। খুব আস্তে উঠে বসে। কিচ্ছু মনে পড়ছে না। পাশে একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ঘুম মেখে। সামনে পুকুর। গাছপালা ঘন। মেয়েটা চারপাশে তাকায়। এই জায়গাটা কোথায়? কলকাতায়? গাড়ির রাস্তা, লোকজন, ঘর-বাড়ি এখান থেকে ঠিক কতটা দূর?

ভাঁটু আর গোবিন্দ আড়ালে দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে দেখে। গোবিন্দ বিড়বিড় করে, মাইয়াটা বড়ই সৌন্দর্য! বড়ই সৌন্দর্য!

মেয়েটার চোখ থেকে টসটস জল পড়ে। মাথায় হাত দেয়। চাপ চাপ রক্ত। সরু ফালি হয়ে রক্ত গালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। গলায় ব্যাথা লাগে। দশ আঙুলের ছাপ। কালচে লাল হয়ে আছে। পৃথিবীটাকে, নিজেকে কেমন ছায়া ছায়া মনে হয়।

ভাঁটু আর গোবিন্দ, দু'জনের দিকে চায়। গোবিন্দ হাসে, বলে এইবার য্যান সব কিছু ঠিক ঠিক লাগতাছে। অহন মাইয়াটার কাছে যাওয়া যায়। আর ডর নাই। অহন ও নিজের ছায়া ছায়া দ্যাখতাছে!

ভাঁটু বলে, হঃ!

মেয়েটা চারদিকে তাকায়। দুটো মানুষ এগিয়ে আসছে। এক জন রোগা মতো, খেঁকুরে চেহারা। আরেক জন গোলগাল। কে এরা? মেয়েটা বোঝে না। শরীরে হাওয়া লাগে। পৃথিবীর সমস্ত হাওয়া যেন মেয়েটার গায়ে এসে জমে। একটু ভয় ভয় করে। কী যেন পাল্টে গেছে, কেমন নতুন সব কিছু।

ভাঁটু পাশে এসে বসে। বলে, ক্যামন লাগে?

মেয়েটা ঘাড় নাড়ে, ভালো। তোমরা কে?

গোবিন্দ হাসে, আমরা দোস্তো। তোমাগো ভাষায়, বন্ধু।

মেয়েটা বলে, আমি কোথায় বলো তো? এখানে এলাম কী ভাবে? কলকাতা থেকে এই জায়গাটা কত দূর?

ভাঁটু কেমন একটু চমকে যায়, বলে তোমার নাম কী গো মাইয়া?

আমার নাম? মেয়েটার চোখ কুঁচকে আসে। নাম মনে পড়ছে না। কিছুতেই মনে পড়ছে না। শরীরের ব্যাথাগুলো কেমন মরে এসেছে। এখন ফুরফুরে লাগছে। কিন্তু মনে গন্ডগোল। কিছুই মনে পড়ছে না।

মেয়েটা একটু কাশে। ভাঁটুর চোখের সামনে হাত তুলে ধরে। বলে, দেখো আমার হাতে কত রক্ত। এত রক্ত কোথা থেকে এল বলো

তো? গলার গাছে দাগ, শাড়ি ভিজে। আমি এমন হয়ে আছি কেন?

ওরা উত্তর দেয় না। মেয়েটার মাথায় হাত রাখে।

মেয়েটা কিছু বোঝে না। দেখে বৃষ্টি পড়ছে। জলের ফোঁটাগুলো যেন শরীরের স্বচ্ছতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। চারপাশ আরও কালো হয়ে আসে। মেঘ ঢেকে দিচ্ছে সমস্তটা। দু'জন অদ্ভুত মানুষের দিকে চেয়ে থাকে। সব কিছুর মানে বুঝতে চেষ্টা করে!

বৃষ্টিতে ভেজা ভেজা হয়ে আছে চারদিক! অবন এক্সইডের সামনে দাঁড়িয়ে। মজা লাগছে। ভিজে পাঞ্জাবিটা গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। হালকা নীল জিনসে ময়লার ছোপ। চুলগুলো চোখের ওপর এসে পড়েছে। শীত শীত করছে! চোখ বুজে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। অবন ফ্লাইওভারের তলায় ছায়া ছায়া অংশটায় এসে বসল। খুব ইচ্ছে করছে ঊর্মিকে আদর করতে। অবন উঁচু রেলিংটায় বসে চোখ বুজল। চোখ বন্ধ করলেই ঊর্মিকে দেখতে পাচ্ছে। ঊর্মি এসে পাশে বসল যেন। নীল রঙের শাড়ি পরেছে। বিনুনিটা অগোছালো। মুখের কাছে চুল উড়ে আসছে। একটা হাত গালে আলতো করে রাখা। ও খুব আদুরে হয়ে বসে আছে। অবনের কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কাল্পনিক একটা কথোপকথন চালানোর চেষ্টা করল। ঊর্মি, তুমি কেমন আছ?

ঊর্মি আলগা হাসল। তারপর ছোট্ট একটা হাই তুলে বলল, এই। তুমি একবার আমার সাথে বইমেলা গেলে না। কেন? আচ্ছা ম্যাকবেথ তোমার কেমন লাগে? কখনো চায়ের ভেতরে জিন মিশিয়ে খেয়েছ? ইউক্যালিপটাসের বনে, তোমার হাত ধরে সে দিন কে বসেছিল বলো তো?

অবন হেসে ফেলল। ঊর্মির এই এক স্বভাব। এলোমেলো প্রশ্ন করে। কোথা থেকে কোথায় হারিয়ে যায়। অবন উত্তর দিল না। বলল, তোমায় আদর করতে ইচ্ছে করছে।

ঊর্মি খিলখিলিয়ে সেহে উঠল, বলল, আদর করবে? কোথায় আদর করবে? দেখো আমার সারাট শরীর রক্তে ভেজা। গলায় দেখো আঙুলের চাপ। তুমি আদর করলে, তোমার শরীরে আমার রক্ত লেগে যাবে যে!

অবন ঊর্মির মাথার দিকে তাকাল। রক্ত চুইয়ে পড়ছে। গলায় কালচে লালের ছোপ।

ঊর্মি হাসছে। বলছে, কী হল, রক্ত দেখে এত ভয়! আদর করবে না আর? এসো প্লিস।

অবনের ভয় লাগছে। ঊর্মির সারা শরীর নীল হয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ রক্তের ফোঁটা শরীরে নেচে বেড়াচ্ছে। চামড়াগুলো কুঁচকে গেছে। অবনের শরীর শিরশির করছে। ঊর্মি এগিয়ে আসছে কেন? মৃত মানুষের মতো লাগছে। চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে, ফিসফিস করে বলছে, আদর করবে না? আর আদর করবে না?

অবন চেঁচিয়ে বলল, না, আদর করব না। আর আমার আদর করতে ইচ্ছে করছে না। ঊর্মি তুমি যাও আমার সামনে থেকে প্লিজ চলে যাও।

ঊর্মি গেল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। শরীর লাল হয়ে মিশে যাচ্ছে। অবন তাকাতে পারছে না।

প্রিটোরিয়া স্ট্রিট থেকে একটা বাইক বেরিয়ে খুব জোরে রবীন্দ্রসদনের দিকে গেল। অবন চোখ খুলল। চারপাশ স্বাভাবিক। ঊর্মি নেই। লালের কোনো আভা নেই। রক্তের ছিটেফোঁটা নেই। কোথাও একটা ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। খুব হুল্লোড়! ছয় চার এইসব শব্দগুলো ভেসে ভেসে আসছে। অবন মোড়ের মাথায় ব্যস্ত ট্রাফিক পেরিয়ে এসে ময়দানের দিকে হাঁটা লাগাল।

ফুলমণি মাহাতো অবনের পেছন পেছন হাঁটছিল। ছেলেটা এলোমেলো চলেছে। ময়দানের মাঠের মধ্যে ঢুকে জুতো খুলে ফেলল। তারপর ঘাসে খুব আলতো করে পা রেখে গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। ফুলমণি এ সব দেখে-টেকে এক গাল হাসল, সিমেন্টের ঢাউস বস্তাটা আজ খালি। কাগজ কুড়োতে ইচ্ছে করছে না। শাড়ির আঁচলে তিনটে বিড়ি বাঁধা থাকে। সারাদিনের বরাদ্দ। আজ এর মধ্যেই তিনটে বিড়ি শেষ। বৃষ্টি কেমন যেন ছটফটানি বাড়িয়ে দিচ্ছে। ছেলেটা একটা ছাতিম গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় বৃষ্টি দেখছে। ঝুম বৃষ্টি। জুতোটা খোলা অনেকটা দূরে। ফুলমণি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে জুতোটা বস্তায় পুড়ল। শিয়ালদা বাজারে ভালো দাম পাবে! ছেলেটার কাঁধের কাছে তিনটে কাঠপিঁপড়ে। ফুলমণি এগিয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, এ বাবু, এত কী বৃষ্টি দেখ? দেখার মতো আছেটা কী?

অবন চমকে পেছনে চাইল। ময়দান ফাঁকা। কোথাও কেউ নেই। এর মধ্যেই রাস্তার বাতি জ্বলে গেছে, মেঘে অন্ধকার! থইথই বৃষ্টি। ঘাসের মাঝখানে পৃথিবীটা হঠাৎ করে ফুরিয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

ফুলমণি আবার ডাকল, হে বাবু।

বন বলল, বৃষ্টিতে কিছু দেখছি না মাসি। এমনি দাঁড়িয়ে আছি। একা একা দাঁড়াতে ভালো লাগছে। তুমিও তো দাঁড়িয়ে রয়েছ।

ফুলমণি হাসে, আরে আমার আর তোমার কথা? দু'জনের কী কিছু মিলমিশ আছে? আমার কাজে মন নাই। কাগজ কুড়াতে ভালো লাগে না। তাই। জল এসে সব কেমন উলট-পালট করে দিল। পুরুলিয়ায় বৃষ্টি কম।

অবন হাসে। কোথা থেকে কাগজ-কুড়ানি বুড়িটা এসে জুটল এখানে ভেবে অবাক হয়। তারপর বলে, তোমার বাড়ি পুরুলিয়া?

—হ্যাঁ, সে এক সময় ছিল বোধহয়। এখন কলকাতা। কথায়ও কলকাতার ছাপ। শহরটা গিলে নিয়েছে। গেরামের লোকে আর

চিনতে পারে না।

এখানে কত দিন মাসি?

হবে বছর কুড়ি। খিদে, খিদে। খিদের জ্বালায় এখানে। বাপ-মা মরল, বারো ভুতে লুটে খেল। মিস্তিরির জোগাড়ে, কাজের মাসি থেকে, এখন আমি কাগজ-কুড়ানি। এই তো জীবন। তা বাবু তোমার খবর কী? একলা একলা পথে ঘোরো, মন মেজাজ খারাপ?

অবন ফুলমণির দিকে চায়। কালো ক্ষয়াটে শরীর, খড়ি ওঠা জিরজিরে হাত। চোখে চমমকি! জীবনকে ফুলমণি ভালোই চিনেছে। অবনের ভেতরের সমস্ত ঘোর ফুলমণিকে দেখতে থাকে। জীবনের ধাঁধা কিছুতেই সমাধান হয় না। বৃষ্টি বেড়েই চলে। ছাতিমের পাতা থেকে জল চুইয়ে আসে। ফুলমণি কাদা মাটিতে থেবড়ে বসে। দেখে অবনের জিনসের উপর রক্ত কালচে হয়ে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। ফুলমণি অবনের হাতের দিকে চায়। দেখে আঁচড়ের দাগ। কেউ যেন ভীষণ ঘৃণায় সমস্তটা ফালা করে দিতে চেয়েছে আঁচড়ে কামড়ে! ফুলমণির কুতকুতে চোখ জ্বলে ওঠে। কেমন সন্দেহ হয় ফিসফিস করে বলে, তোমার পায়ে রক্ত কেন বাবু?

মেয়েটা পুকুরের পারে এসে বসেছে। ভাঁটু আর গোবিন্দ পাশে। ভাঁটু বলে, মাইয়া তোমার ব্যথা করে?

মেয়েটা মাথা নাড়ে, নাঃ, ব্যথা করে না। মাথায় না, গলায় না, সমস্ত শরীরের কোথাও এতটুকু ব্যথা নেই।

গোবিন্দ নরম করে বলে, মাইয়া তোমার ক্ষুধা পাইছে?

নাঃ, মেয়েটার খিদেও পায়নি।

ভাঁটু হাসে। বলে, শরীরে ব্যথা-বেদনা নয় কিছুই নাই, কিন্তু মনটা? হেডার খবর কী? কিছু মনে পড়ে?

নাঃ, কিছু মনে পড়ছে না। কে ও? কোথা থেকে এসেছে। কোথায় যাবে? কিছুই না!

গোবিন্দ ছলছলে চোখে ভাঁটুকে দেখে। আহারে, কতই বা বয়স মাইয়াটার। সারটা জীবন এখন কাটবে কী কইরা? কে দ্যাখবে ওরে?

মেয়েটা শাড়ির আঁচল ঠিক করে। পুকুরের জলে নিজের ছায়া দেখে। ছায়াটা কাঁপতে থাকে। মেয়েটা গালের থেকে রক্ত দাগ মুছতে চায়। ওঠে না। এত বৃষ্টি, এত জল, তাও রক্ত ধুয়ে যায় না কেন?

অবন পায়ের থেকে রক্তের দাগ মুছতে চেষ্টা করে, ওঠে না।

ফুলমণি হাসে, বলে ও সব দাগ কী এত সহজে ওঠে বাবু? জন্মের দাগ! রক্ত বড় সাংঘাতিক গো।

অবনের শরীর শিউরে ওঠে। চারপাশে কালো বেড়েই চলছে। বাস-ট্যাক্সি এত ঝড়-জলে কমে এসেছে। কলকাতা কেমন স্তব্ধ হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। মানুষহীন শূন্য নগরী যেন! ফুলমণি ঘোলাটে চোখে চেয়ে আছে। অবন চোখ বুজে বসে পড়ে গাছের গোড়ায়।

ফুলমণি বলে, আপনার গল্পটা কী যেন বাবু?

অবন ফিসফিস করে বলে ঊর্মি! আমার সব গল্পেই শুধুই ও।

ঊর্মি কে বাবু?

আমার সমস্ত কিছু। আমি ভালোবাসি ওকে, ভীষণ ভালোবাসি।

তারপর? ভালোবাসা উবে গেল, না বাবু?

ও এখানে ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকে। বালিগঞ্জে! সেক্টর ফাইবে বড় একটা মাল্টি ন্যাশনালে কাজ করে। অনেক রোজগার। ওর ফ্যামিলির সবাই থাকে বর্ধমান। আমি ওকে দেখেছিলাম অ্যাকাডেমিতে, পঁচিশে বৈশাখ, সকালে। হলুদ শাড়ি, মাথায় লাল চন্দ্রমল্লিকা। দারুণ। রাতে আমায় কবিতা পেয়েছিল। ঊর্মিকে নিয়ে লেখা আস্ত একটা কবিতা। এত সুন্দর ও! পরে দিন অফিসে দেরি করে গেলাম। অ্যাকাউন্টসের কাজ। এক্সিকিউটিভ খুব বকল। আমার কানে ঢুকল না। মাথায় তখন শুধুই ঊর্মি। তারপর একটা দুটো অনুষ্ঠানে দেখা ও কবিতা ভালোবাসে। আমি লিখতে। নামকরা কাগজে আমার লেখা বেরোয়। ও প্রেমে পড়ে গেল আমার। মেয়েটা আশ্চর্য হাসতে পারে।

বাবু, সত্যি কি কিছু আছে ভালোবাসা বলে?

অবন ফুলমণিকে থামিয়ে দিল। আছে, আছে। আমার ভেতরে যে তীব্র রক্তক্ষরণ, অনুভূতি, সেই সব তো ভালোবাসা। কিন্তু ভালোবাসার সাথে সাথে আর কী যেন একটা ভেতরে এসে ঢোকে। এক্সপেক্টেশন? জানি না। ঊর্মি আমার থেকে বেশি উপার্জন করে, ওদের ফ্যামিলি স্ট্যাটাস আমার থেকে অনেক বেটার, ও সুন্দর! ওর অফিসের রাহুল, আমার থেকে অনেক ভালো অপশন ওর জন্য। আমার কী ঈর্ষা হচ্ছিল?

না রে বাবু, তোমার যা হচ্ছিল তাকে বলে পাগলামো।

অবন অন্ধকারে ফুলমণির দিকে তাকায়। আবছা আবছা হয়ে যাচ্ছে সমস্ত কিছু। বলে, পাগলামো? হবে হয়তো! রাহুল কাল ওর ফ্ল্যাটে এসেছিল। সন্ধ্যা থেকে রাত। আমি ঢুকতেই, ঊর্মি কেমন ছটফট করে উঠল। ঊর্মির শাড়িটা এলোমেলো ছিল, ওর গাল দুটো গোলাপি হয়েছিল। রাহুলের চোখ...আমার মাথা কেমন যেন গোলমাল করে উঠল। মনে হল, মেয়েটা আমায় নিয়ে খেলা করছে না

তো? রাহুল আর আমায় একই সঙ্গে পুতুল বানিয়ে নাচাচ্ছে! ঊর্মির মতো মেয়েরা সব পারে! হাতের কাছে পেতলের ফুলদানিটা ছিল। সেটা দিয়ে ঊর্মির মাথার পেছনে খুব জোরে মারলাম... তারপর সমস্ত ঘরে রক্ত। ঊর্মি আমার পায়ের কাছে পড়ে গেল। তারপরও আমার রাগ কমেনি, খুব জোরে ওর গলায়, আমার দু'হাত এত জোরে ওর গলায়...। গলায় আমার আঙুলগুলো বসে গেল।

ফুলমণি বলে, তারপর কী করলে বাবু?

মন হল ও মরে গেছে। গ্যারাজ থেকে ওর গাড়ি বের করলাম। ওকে তুললাম ও তখন ফিসফিস করছে। আমার ভীষণ ঘেন্না হল। এখনও মরেনি মেয়েটা...। কাল রাতেও খুব বৃষ্টি। ডায়মন্ড হারবার রোড অনেকটা গেছি। একটা ভাঙা বাড়ি, পেছনে আলো ফুটছে। আমি পালিয়ে এসেছি। ধরা পড়ে যাব আমি, জানি, জানি।

ফুলমণি হাসে, তুমি তো ধরা পড়ে গেছ বাবু। নিজের কাছে। মেয়েটাকে মারছিলে যখন তুমি, কিছু বলেনি ও?

বলেছিল। বলেছিল, তুমি ভুল বুঝছ। আমি তোমাকেই ভালোবাসি, শুধু তোমাকে।

ফুলমণি ঠোঁট টেপে। হায় রে ভালোবাসা? ভালোবাসা মারে না বাঁচায়? কেমন ভালো যে তোমরা বাসো? নিজের জীবন, পরের জীবন, তোমাদের একটু মায়া নেই গো? একটুও সাড় নেই?

ভাঁটু আর গোবিন্দ মেয়েটার চোখে চোখে রাখে। বলে, মাইয়া চলো আমাগো সাথে।

মেয়েটা ভয় পায়, তোমাদের সাথে? কেন? আমি বাড়ি যাব।

তোমার বাড়ি কোথায় মনে পড়ে?

না, মনে পড়ছে না।

মাইয়া, এত বোঝো তুমি আর হেইডা বোঝো না যে তুমি অহন আর বাইচ্যা নাই, তুমিও লাশ, আমাগো মতো।

মেয়েটা ভয়ে চিৎকার করে।

আরে মাইয়া ভয় কিসের?

তোমরা ভূত? আমিও তাই?

আরে দূর বোকা। ভূত কারে কয়? যা অতীত, যা ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাই, বাঁচা-মরা নাই, ক্ষুধা নাই, তেষ্টা নাই, ব্যথা নাই, বোধ নাই, ঘেন্না-ভালোবাসা কিচ্ছু নাই। তোমার আছে এসব? তুমি ভূত নয় তো কী? তোমার জীবন আছে? সবুজ লকলকে লাউডগার মতো একখান জীবন? আছে তোমার?

মেয়েটা মাথা নাড়ে। না, কিচ্ছু নেই এমনকী নামও নেই। কে যেন একটা ভালোবাসার স্বপ্ন দেখিয়ে সব কিছু কেড়ে নিয়ে গেছে। এখন শুধু ভালোবাসা নামের শব্দ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। কবে শেষ হয়ে গেল এ সব? কবে ভূত হয়ে গেল ও?

ভাঁটু বলে, ভয় কী মাইয়া? আমরা আছি তো ফের নতুন কইরা শুরু। শুরুর তো কোনো শ্যাষ নাই। আমাগো কিছু নাই? বাঁচা মরা নাই তাই আমাগো ভয়ও নাই।

মেয়েটা ফিসফিস করে, আমি এখান কী করে এলাম জানো তোমরা?

ও সব কথা জাইনা হইব কী? পেছনে কিছু নাই রে মা। সব সামনে।

মেয়েটা ছলোছলো চোখে আকাশে তাকায়। এটাই পৃথিবী? বড় মায়া! মায়া এসে আঁচল বিছায়। জীবন আর মৃত্যু বোঝা দায়। বেঁচে থাকা, মৃত্যু সব মিলেমিশে একবার।

অবন উঠে দাঁড়ায়। ফুলমণিকে দেখতে পায় না। হাওয়া হয়ে গেছে। ধূসর শহর, বেওয়ারিশ লাশ। অবনের জুতোটা রাখা রয়েছে একটু দূরে। আর একটু হাঁটতে হবে, পার্ক স্ট্রিট থানা। শেষমেশ ফুলমণি কিছু নেয়নি, জুতোটাও না।

কলকাতার বৃষ্টি বিলাস চলতে থাকে। শহরটা দিন দিন কেমন দুমড়ে মুচড়ে চলেছে। শুধু মেঘে মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে দু'একটা গল্প এসে ঘোর তৈরি করছে। অনেক রাত ইরাবতী চারপাশে চাইতে বাবুঘাটের গঙ্গার কাছে এসে বসে। নখের কোণটায় রক্তের ছিটে লেগে আছে। অমিতাভর বুকে বুলেটের ক্ষত থেকে এখনও বোধহয় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ইরাবতীর একটু ভয় ভয় লাগে। পেছন থেকে কে যেন বলে, এই মেয়ে তুমি অমন ছটফট করছ কেন? তোমার কথা আছে কিছু? আমাকে বলবে? ইরাবতী ঘাড় ঘোরায়। কে? ভালো করে দেখা যাচ্ছে না আবছা অন্ধকারে, কে ওখানে?

দাঁতের সারি ঝলমলিয়ে ওঠে, কুতকুতে চোখে, কালে শরীর নিয়ে হেসে বলে, ফুলমণি, আমি ফুলমণি মাহাতো। ফুলমণি এভাবেই শহরে ঘুরতে থাকে। মানুষের গল্প সংগ্রহ করে। মানুষটা নিজের কাছে ধরা পড়ে যায়, চেনা চেনা লাগে। ফুলমণিকে সামনে রেখে ভুলের কাহিনী শোনায়। প্রতিদিন নতুন কথা। গঙ্গায় জোয়ার-ভাটা আসে। বৃষ্টি ঝরঝর বাজতে থাকে।